**মস্কোর বরফবিথী ও একজন সুতপা**

**পর্ব-১৯**

ইদানিং পড়াশুনা নিয়ে অপুর্বর খুব ব্যস্ত সময় যাচ্ছে।

প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে সুতপা অপুর্বর সঙ্গে দেখা করতে যায়। এক সাথে রান্না-বান্না করে, খাওয়া দাওয়া করে। সারাটা দিন অপুর্বর সঙ্গে কাটায়, দুঃখ-সুখের কথা বলে। তবে ইদানিং দুঃখের পাল্লাটাই যেন বেশি ভারি হয়ে ওঠে। প্রায় প্রতিদিনই পাওনাদারদের কেউ না কেউ আসে অপুর্বর হোস্টেলে । দরজায় নক করে। কিছুক্ষন অপেক্ষা। তারপর না পেয়ে চিরকুট রেখে চলে যায়।

সময়ের বুকে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে থাকে অপুর্ব-সুতপার জীবন। কখনো সেলিম বা বেয়াই এসে মালামাল বিক্রির খবরাখবর দেয় সুতপাকে। বিক্রির টাকা রেখে যায়, যদিও তা যৎসামান্য, তবুও রেখে যায়।

সেলিম মাঝে মধ্যে অপুর্বর মিখলুখা মাখলায়ার হোস্টেলে গিয়ে অপুর্বর চিঠি পত্র নিয়ে আসে। সুতপা সেগুলি একটা একটা করে কেচি দিয়ে যত্ন করে মুখটা খুলে চোখ বুলায়। প্রয়োজনীয় হলে পরে অপুর্বর কাছে নিয়ে আসে।

সুতপাও পড়াশুনা নিয়ে ব্যাস্ত সময় পার করছে। পড়াশুনার ইতি টানার আর মাত্র দুটো বছর। ডিগ্রীটা ভালোভাবে শেষ করার দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে কাটে সময়।

এতো সামাজিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক মন্দা, ব্যাবসায়িক বিপর্যয় তার পরেও সুতপা লেখাপড়ায় কোন গাফিলতি করেনি। ক্লাশ মিস করেনি। শীতের বরফ আর তুষারপাতকে ঠেলে প্রতিদিন সকালে ক্যাম্পাসে যেত। অপুর্ব সবসময় সুতপাকে মনের সাহস যুগিয়েছে, পড়াশুনায় সাহায্য করেছে, নান্দনিকতার পরশ ছড়িয়েছে। এতে সুতপা বেশ মনোবল পেত। জীবনের খুঁটি নাটি অনেক বিষয়ে ভাবতে হতো না। সব সময় অপুর্ব এসে হাজির।

কিভাবে যে একটি জীবন আরেকটি জীবনের সাথে মিশে যায়, একটি মনের সাথে আরেকটি মন জড়িয়ে যায় সুতপা বুঝতে পারেনি। আজ ক্ষনিকের দুরত্বের ব্যাবধান যেন সুতপাকে এক নতুন ধ্রুপদীয় উপলব্ধির দোড়গড়ায় পোঁছিয়ে দিল। সুতপা বুঝতে পারলো অপুর্বকে নিয়েই সুতপার জীবন। বর্তমান ও ভবিষ্যতের পথ চলার পরম সারথী। তাই অপুর্বর এই করুণদশা সুতপাকে প্রতিনিয়ত দ্বগ্ধ করছে। ভাবনায় এক বিষাদের প্রলয় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সারাক্ষন মনটা কেমন ধরফর করে। খাওয়া-দাওয়ায় আগের মতো তেমন ইচ্ছে জাগে না। আজ কিছুটা হলেও সুতপা একা। অনেক কিছুকেই সামলাতে হচ্ছে নিজে।

নানা কারনে সুতপার শরীর এবং মন দুটিই ভেঙ্গে পড়ছে। তলপেটের বা দিকটায় প্রায় সময় কেমন একটা ব্যাথা অনুভব করে। এর মধ্যে দুই-তিনবার পলিক্লিনিকে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছে। রক্ত পরীক্ষা সহ এক্সরে করানো হয়েছে। তেমন কোন সমস্যা নেই বলে ডাক্তার সুতপাকে আশ্বস্ত করেছে। ব্যাথা হলে পেইন কিলার খেতে বলেছে।

অপুর্বকে এই ব্যাপারে কিছুই জানয়নি। এতে অপুর্বর উদ্বিগ্নতা বাড়বে সেই ভয়ে। সুতপা ভালো করেই জানে অপুর্ব সুতপাকে নিয়ে কতোটা ভাবে। এবং কোন অজ্ঞাত শংকায় খুব মন খারাপ করে।

এখন পড়াশুনা আর সংকটময় মুহুর্তের এলোমেলো ভাবনা ছাড়া আর কোন ব্যাস্ততা নেই।

তাই এক সিনিয়র ভাই এর অনুরোধে অপুর্ব আবার সাহিত্যকাজে মনোনিবেশ করে। “ইদানীং সমাচার” নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা করে। প্রথম বাংলা পত্রিকা। গল্প, কবিতা, নির্দিষ্ট কলাম সহ সাম্প্রতিক দেশ বিদেশের ঘটনাসমুহ নিয়ে আট পৃষ্ঠার প্রতিটি সংখ্যা সাজানো হবে। মস্কোতে অধ্যায়নরত বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা নিয়েই ছাপানো হবে পত্রিকাটি।

পত্রিকায় কাজ করার অভিজ্ঞতা মূলত: কারোরই ছিলো না। তবে জিয়া ভাই নামে একজন যুক্ত হয় এই পত্রিকাটির সাথে যার রয়েছে বাংলাদেশের প্রথম সারির বেশ কয়েকটি দৈনিকে কাজ করার বেশ অভিজ্ঞতা। আর অপুর্বর ছিলো লেখার দক্ষতা।

যিনি পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষকতা করছেন তিনি একজন সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যাবসায়ী। কম্পিউটার ব্যাবসা করে বেশ পয়সা কামিয়েছেন।

তিনিই পত্রিকার জন্য অফিস খুলে দিলেন। ৩-৪ জনের নিয়মিত কাজ করার ব্যাবস্থা করে দিলেন। অপুর্ব নিয়মিত সেই অফিসে যেত। টেবিলে বসে গরম চায়ে ফু দিয়ে দিয়ে চা সিগেরেটে ডুবে থাকতো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলতো খোশ গল্প। বেশ ভালো ভাবেই সপ্তাহগুলি কেটে যেত।

সেইখানেই পরিচয় হয় জাকির ভাইয়ের সাথে। পুরো নাম জাকির হোসেন। মস্কো এসেছে পিএইচডি করতে। সদা হাস্যোজ্জ্বল, বিনয়ী এবং সহজ সরল। পরোপকারী। প্রথম সাক্ষাতেই আপন করে নেওয়ার এক অপার সন্মোহনী শক্তি।

-আপনার কথা অনেক শুনেছি, অপুর্ব-এই বলেই হাতটি বাড়িয়ে দেয়।-আপনি কেমন আছেন?

-ভালো, আপনার সাথে আমার এই প্রথম দেখা। আমার নাম যে অপুর্ব কেমন করে জানলেন-অপুর্বর উৎসুক চাহনি

-মস্কোতে আসার পরই অনেকের কাছেই আপনার নাম শুনেছি। আপনার দুই নম্বর ব্লকেও কয়েকবার গিয়েছি। অবশ্য আপনার সাথে কখনো দেখা হয়নি

-আমি আসলে অনেক দিন ধরেই প্লানেরনায়াতেই থাকি

-তাও জানি। সুতপার কথাও অনেক শুনেছি। ভালো কবিতা আবৃত্তি করে। কোন এক অনুষ্ঠানে ওর আবৃত্তিও শুনেছি।

-তাই নাকি? অবাক আপনার সাথে আমার আগে দেখা হয়নি। আপনি কতোদিন যাবৎ মস্কোতে আছেন

-প্রায় ছয় মাস হয়ে গেছে। তবে বেশী বাইরে যাওয়া হয়নি।

-আপনি কি পড়তে এসেছেন?

-হ্যাঁ, পেট্রিস লুমুম্বায়। পিএইচডি করছি

-খুব ভালো

তারপর অনেক কথা হলো। প্রতি সপ্তাহে দেখা হতো। ধীরে ধীরে আলাপ পরিচয় থেকে গড়ে উঠে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক। বয়সে অপুর্বর বড়ো। জাকির ভাই বলে অপুর্ব সম্বোধন করে।

সুতপাকে নিয়েও অপুর্ব জাকির ভাইয়ের ফ্লাটে যেত মাঝে মধ্যে। সুতপাকে বেশ ভালোবাসে জাকির ভাই। আদরের ছোট বোনের মতো। সময় পেলেই সুতপাকে দেখতে হোষ্টেলে চলে যেতো। ব্যাগ ভর্তি জিনিস পত্র নিয়ে যেত। নিজে রান্না-বান্না করে খেয়ে আসতো। কখনো সখনো সুতপাকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে যেতো। প্রায়ই সুতপাকে বলতো-

-কখনো মন খারাপ করবে না। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকে বলো। আমাকে বড়ো ভাই জেনো। কোন কিছুতে সংকোচ বোধ করো না

-না না, জাকির ভাই। আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমার প্রয়োজন খুব কম-সুতপা হাসতে হাসতে বলতো

-আমি জানি। তোমার কথা অপুর্বর কাছ থেকে সবই শুনেছি। তোমার মতো মেয়ে খুব কমই হয়। তুমি সত্যিই খুব অসাধারন

-কি বলেন? আমি সত্যিই খুব সাধারন মেয়ে জাকির ভাই-সুতপা বলতো

-আমি জানি, অপুর্বকে নিয়ে তুমি সবসময় চিন্তায় থাকো। সবই ভাগ্য। সবাইর সব সময় একরকম যায় না। তোমরা ভালোভাবে পড়াশুনা করো-এটাই হবে সবচেয়ে বড়ো কাজ। যা কিছু হইছে একটা খারাপ স্বপ্ন ভেবে ভুলে যাও। একদিন দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে

-তাই যেন হয়-সুতপা উত্তর দিতো।

এমনি করেই জাকির ভাই অপুর্ব সুতপার জীবনে প্রবেশ করলো। যেন আশির্বাদের ছায়া। সবসময় অপুর্ব-সুতপার খোঁজ খবর নিতো।

সুতপাও যেন জাকির ভাইকে পেয়ে কিছুটা সাচ্ছন্দ্যবোধ করলো।

বিশ্বাস করে নিজের ভাবনাগুলিকে ভাগ করার একজন কাছের মানুষ পেলো। এমনি করে এক অমলিন অমিয় বিশ্বাসে, শোভন বন্ধুত্বে জীবনের গন্ডোলায় হেঁটে চলতে থাকে। পৃথিবী যখন রুদ্ররোষে পরিপূর্ন, মানুষের অন্তর-বাহির যখন গড়লে আবৃত, কুটিল হিংস্রতা স্বার্থপরতার বিবশ মরুর খরা রুক্ষতার অবয়ব, সেই অনিকেত সময়ে জাকির ভাইয়ের হিমাদ্রির মতো স্নেহ ভালোবাসায় এক দন্ডে শিক্ত হয়ে উঠে সুতপার মন। খুঁজে পায় এক অমলিন নির্ভরতা। কখনো কখনো আঁখি হয় ছল ছলে।

কিন্তু জীবন যে আঁকা-বাঁকা সর্পিলাকারে এগিয়ে চলে। প্রতিটি চলার বাঁকে কোন এক অজানা অদৃশ্য বিপদ অপেক্ষা করছে, তা কে জানতো? সুতপা-অপুর্বও জানতো না। নানা সমস্যার ভেতর দিয়ে চলতে চলতে জীবনের গতিপথ যে হঠাৎ করেই থমকে দাঁড়াবে কিছুক্ষনের জন্য। অবিশ্বাস আর ভুল বুঝাবুঝির বিষাদের দহনের তাপদাহে দুমড়ে মুছড়ে যাবে এতো দিনের গড়া প্রেম-ভালোবাসা আর অমিয় বিশ্বাসের মন্দির। তার পর হঠাৎ করেই দুজনার পথ বাঁক নিবে দুদিকে এক অপরিচিত গন্তব্যে অসমান্তরালে।

কেউ ভাবেনি একদিন কোন এক অশুভ মুহুর্তে কারো মনে জেগে উঠবে ভালোবাসা নয় বরং ঘৃনার দূর্বাসা, প্রচন্ড রাগ, লজ্জ্বা আর বিচ্ছেদের তৃষ্ণা।

একদিন তাই ঘটে গেলো অপুর্ব সুতপার জীবনে।

এ কোন প্রাচ্য-আর পাশ্চাত্যের সংঘাত নয়, ব্রাহ্মন আর ক্ষত্রিয়ের ব্যাবধানের মানষিক দ্বন্দ নয়। এবারের সংঘাত মনের সাথে মনের, ভালোবাসার সাথে ভালোবাসার, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের। যাকে এতোদিন জীবনের সবটুকু সঁপে দিয়েছিলো, পূঁজোর বেদী ভেবে অর্ঘ্য দিয়েছিলো দিনের পর দিন, সে যখন ধরা দেয় প্রতারনার মলিন রুপে, ভালোবাসার মানুষটির বিশ্বাসে তুলে অবিশ্বাসের অনুরনন সেখানে বিষাদের কালো ছায়া অনিবার্য।

সেদিন ছিলো ছুটির দিন। এই দিনটা আসলেই সুতপার মনটা আনচান করে উঠে। কখন দেখা হবে অপুর্বর সাথে। প্রায় সময়ই সকাল সকাল চলে যায়। এক সাথে রান্না-বান্না করে। কিন্তু গত সপ্তাহে অপুর্বকে বলে এসেছিলো আজ দুপুরের পরে আসবে। হোস্টেল থেকে রান্না-বান্না করে নিয়ে যাবে। সারা বিকেলটা অপুর্বর সাথে থাকবে। সুতরাং অপুর্ব যেন সকাল বেলাটাই পড়াশোনায় ধ্যান দেয়।

সুতপা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে। গতকাল বেয়াই সবজি আর ল্যাম্বের মাংস কিনে এনেছিলো। অপুর্ব ল্যাম্ব ভূনা খুব পছন্দ করে। আর আজকের দিনটাও একটা বিশেষ দিন। এই দিনটিতেই সুতপা প্রথম মস্কোতে আসে। অপুর্বর সাথে দেখা হয়। তাই একটু পায়েসও তৈরী করবে। সাথে এক তোড়া ফুল। প্রিয় মানুষটির জন্য এতোটুকু করার মাঝেই আছে পরম আনন্দ। তাই সুতপার মনটা আজ বড্ডো ভালো, যেন আনন্দের ফুলকি চোখে মুখে। গুন গুন করে গান করছে। ইচ্ছে ১১টার মধ্যেই রান্নার কাজটা শেষ করে নেবে।

সেলিম মিখলুখা মাখলায়া থেকে আসলেই সুতপা বেরুবে। স্নানের কাজটাও এর মধ্যে সেরে নেবে।

সকালে সেলিম বেরোনোর সময় সুতপাকে বলে গিয়েছিলো-

-সুতপা, আমি বাইরে যাইতাছি। কিছু আনতে হইবনি। তুমিতো আবার কিছু রান্না-বান্না করবা

-কিছু লাগবেনা, সেলিম ভাই। কাল বেয়াই সব কিছু কিনে এনেছে। আর আপনি যাচ্ছেন কই এতো সকালে

-মিখলুখা মাখলায়া

-কোন কাজ আছে নাকি?

-আছে। আমি একটু ১০ নম্বর ব্লকে একজনের সাথে দেখা করতে যাবো

-তা হলে একটু ২ নম্বর ব্লকে যাবেন কষ্ট করে?

-অবশ্যই। তা হলে চাবিটা দাও। কোন প্রয়োজনীয় চিঠি থাকলে তুমি অপুর্বর কাছে নিয়ে যেতে পারবে।

চাবিটা এনে দিলে সেলিম বেড়িয়ে পড়ে।

সুতপার কাছ থেকে একটা ছাতা নিয়ে যায়। গত রাত থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। বরফ গলা জলে রাস্তাগুলো থক থক করছে। হাঁটতে গেলে প্যাক প্যাক আওয়াজ হয়।

কোন বিশেষ দিনে বৃষ্টি এলে সুতপার মনটা উদাস হয়ে উঠে। কেমন একটা সুখ সুখ অনুভব লাগে। সব কিছুতেই ভালো লাগার একটা পরশ পায়। বৃষ্টির দিনগুলি যেন সুতপাকে অপুর্বর কথা ভাবায়, বৃষ্টির মতোই, আপনজনের ভালবাসায় যেন সুতপার দেহ-মন ধুয়ে মুছে দেয়। সাত্ত্বিকতার ছোঁয়া লাগে সারা মন প্রানে।

তাই আজকের বৃষ্টির দিনেও সুতপা বেশ উৎপলা। মনে যেন রং ধরেছে।

সেলিম চলে যায়। সুতপা রান্নায় মনোযোগ দেয়। এক সময় রান্না-বান্না শেষ হয়। বড়ো একটি টিফিন বক্সে ভরে নেয়। আজ সকালের খাওয়াটা এখনো হয়নি। তাই সকালের খাওয়ার ব্যাবস্থায় মনোযোগ দিলো। তেমন কিছু না। সবজি দিয়ে রুটি খাওয়া। একটি প্লেটে নিয়ে বসতে যাবে এমন সময় দড়জায় কেউ যেন নক করলো

-বেয়াই, আপনি?

-আসলাম আপনার রান্না-বান্না দেখতে। দেখলাম রান্না ঘরে কেউ নাই। বুঝলাম রান্না-বান্না হয়তো শেষ।

-এই মাত্র শেষ করে আসলাম। আসেন একটু খাবেন

বেয়াই আর কিছুই বলেনি। এক সাথেই দুজনে খাওয়া দাওয়া করলো। অনেকক্ষন গল্প চললো। বাইরে তখনো বৃষ্টি চলছিলো। তবে খুব হালকা। মাঝে মধ্যে হালকা বাতাসে বৃষ্টি গুলো শাড়ীর আচলের মতো উড়তে দেখা যায় জানালার কাঁচ দিয়ে। ভারী মিষ্টি।

দেখতে দেখতে সকাল গড়িয়ে দুপুরে পা দিলো।

এর মধ্যে সেলিম এলো। একটা পলিথিনে ব্যাগ সুতপার হাতে তুলে দিলো। সুতপকে বললো-

-অপুর্বর দেশ থেকে মনে হয় চিঠি আইছে। মনে কইরা নিয়ে যাইও।

এই বলে সেলিম চলে যাচ্ছিল, সুতপা ডাকলো-

-আপনি চলে যাচ্ছেন কেন, সেলিম ভাই? রান্না করেছি-খেয়ে যান

-আমি খাইয়া আইছি। এখন কিচ্ছু খেতে পারবো না। তুমি কখন যাবা?

-দুইটার পর।

-ঠিক আছে, সাবধানে যাইও। সন্ধ্যায় দেখা করবো। খাবার একটু রাইখ্যা দিও-এই বলেই সেলিম চলে গেলো। সাথে সাথে বেয়াইও বেড়িয়ে গেল। যেতে যেতেই সেলিম বলে যাচ্ছে-

-ছাতাটা নিয়ে যাইও কিন্তু। বাইরে কিন্তু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। থামবে বলে মনে হয় না

-ঠিক আছে বলে সুতপা দরোজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়।

চিঠির ব্যাগটা সোফায় রেখে বাথরুমে চলে যায় সুতপা। স্নানটা করবে। তবে মাথাটা ভিজাবে না। লম্বা চুলে জল লাগলে শুকাতে সময় লাগবে।

বাথ রুম থেকে আবারো সুতপার কন্ঠে গুন গুন আওয়াজ আসছিলো। মনটা বেশ ফুর ফুরে মেজাজের। খুব তাড়াতাড়ি স্নানটা শেষ করে এলো।

ঘরে এখন কেউ নেই। রুম মেট চলে গেছে অন্য শহরে। এক সপ্তাহ পরে আসবে। তাই মাঝে মধ্যে একাকী থাকলে মনটা ফুরফুরে থাকে। অনেক কিছু করতে ইচ্ছে করে। স্নানটা সেরে রুমে এসে সুতপা টেপ রেকর্ডারে একটা ক্যাসেট লাগিয়ে দিলো। হেমন্তের কন্ঠে রবীন্দ্র সংগীত “আমার পরান যাহা চায়”।খুব পছন্দের গান। প্রায় সময়ই অপুর্ব গানটি গায়। আজ গানটি শুনতে কেন জানি আরো ভালো লাগছিলো।

বাইরে বৃষ্টিটা যেন থেমেছে। আকাশের মেঘলা ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। আকাশটা একটু একটু পরিস্কার হয়ে উঠছে। রৌদ্র হবে হবে ভাব। দিনটা ভালোই কাটবে মনে হয়।

চুলগুলি ভালোভাবে আচড়িয়ে নিয়ে সুন্দর নতুন এক জোড়া স্যালোয়ার কামিজ পড়ে নেয়। অপুর্ব দেশ থেকে এনেছিলো। আড়ং এর নামটা এখনো পিন দিয়ে আটকানো। আয়নার সামনে গিয়ে মুখটা ভালো করে সাজাতে থাকে। মেক আপ করে। একটু পরে রওনা দিবে।

এবার চিঠির ব্যাগটার দিকে নজর পড়ে। আস্তে আস্তে ব্যাগ থেকে চিঠিগুলো খুলে। অনেকগুলি চিঠি। দেশ থেকেই এসেছে। অপুর্বর বড় দাদা আর মায়ের পাঠানো দুটি চিঠি। একটি চিঠি বেশ অপরিচিত। আর বাকিগুলো অপ্রয়োজনীয়ই মনে হলো। এবার অপরিচিত চিঠিটির খামটি হাতে নিল। রঙীন খামের পেছনে যে পাঠিয়েছে তার নামটি লেখা-শেফালী দাস জবা। ঠিকানা-ডুমুরিয়া, কোটালীপাড়া উপজেলা, গোপালগঞ্জ।

সুতপা বেশ অবাক হলো।

এই নামেতো কাউকে চেনে বলে মনে হয় না। অপুর্বর মুখেও আগে এই নামটি কখনো শুনেনি।

কে এই শেফালী? অপুর্বর কোন আত্মীয়া? কিন্তু কি করে? মনটা কেমন ধরফর করতে লাগলো। হাত দুটি কাঁপতে লাগলো। খুলবে কি খুলবে না-এক মুহুর্ত ভাবলো। নাহ্ আর দেরি করতে পারলো না। হাতের আঙ্গুল দিয়েই চিঠির মুখটি খুলে ফেললো। ভাঁজ করা চিঠিটি। রঙীন কাগজে লেখা। এক পাশে লাল লিপিষ্টিক দেওয়া ঠোঁটের ছাপ। ভাঁজটি খুলতেই দুটি লাল গোলাপের পাঁপড়ি দেখতে পেলো।

চিঠিটি এবার দু’হাতে ধরে চোখের সামনে ধরলো। নীচে লেখা আছে-“তোমার আদরের প্রিয়তমা জবা”।

হঠাৎ করেই যেন বুকের ভেতর কালবোশেখীর ঝড়ো বাতাস বইতে লাগলো। আকাশের বজ্রপাতের মতো চমকে যাচ্ছিলো হৃদয়ের গহীন তল্লাটগুলো। চমকিয়ে উঠছিলো সুতপা। তার শরীর বরফের মতো অবশ হয়ে আসছিলো। সারাটা গা থর থর করে কাঁপছিলো। চিঠির উপরের লাইনটি নজরে পড়লো। “প্রিয়তমাসু অপুর্ব” দিয়ে চিঠিটি লেখা।

সুতপার বুঝতে আর বাকী রইলো না যে অপুর্বর জীবনে রয়েছে আরেকজনের উপস্থিতি।

মুহুর্তেই যেন পৃথিবীটা গভীর অন্ধকারে ডুবে গেলো। কেমন ধুসর লাগছিলো চারিদিক। পাশে কেউ নেই। এক সময় হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো। বুকের ভেতরটা তখন হাহাকার মরুভূমির রোদেলার বিষাদ। পৃথিবীটা কেমন যেন শান্ত হয়ে গেলো। জানলা দিয়ে চিকন সোনালী রোদ ঢুকে এসে সুতপার চোখের জলে ভেজা মুখে আছড়িয়ে পড়লো। এ কেমন যন্ত্রনা সুতপাকে ঘিরে ধরলো সে অনুমান করতে পারছে না। কিছু ভেবে শেষ করতে পারছে না।

কি করে আচ্ছন্ন করা জগত থেকে সে বের হয়ে আসবে? তার পথ কোথায়? আষ্টে-পৃষ্টে জড়ানো বিশ্বাস, কত পথ চলে গেছে। তাকে ফেরানো যায়? কি করবে সুতপা?

আকাশ থেকে আদম সুরত বা চাঁদের কাছ থেকে ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রটি কখন নিভে গিয়েছিলো তা না জেনেই কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো সুতপা।

কিছুই টের পায়নি। শুধু মনে আছে মাথাটা সোফাতে ছিলো। ফ্লোরে কার্পেটের উপর বসেই চিঠিটা দেখছিলো। পড়া হয়নি। চুলগুলো অবিন্যস্ত লাউয়ের ডগার মতো ছড়িয়ে আছে। শরীরটা ভীষণ দূর্বল লাগছে। মনে হচ্ছে হাত-পায়ের জোড়াগুলো থেকে কে যেন ভেইনগুলো নিয়ে গেছে। কি অসহ্য! কেমন একটা অস্বস্তি, যেন কাটতেই চায় না।

বড় অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে। একটু আগেও যে পৃথিবীটা এতো সুন্দর ছিলো তা কেমন করে যে অসুন্দর হয়ে গেলো বুঝতেই পারছে না। জীবনের সোনা ঝরা দিনগুলো চোখের সামনে বুদ বুদ ফেনা হয়ে ভাসতে লাগলো। মাথাটা কেমন ঝিম মেরে আছে।

পাশে চোখ ফেরাতেই চিঠিটা নজরে পড়লো। ফ্লোর থেকে তুলে নিয়ে পড়তে লাগলো।

**প্রিয়তমাসু অপুর্ব,**

তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। তুমি নিশ্চয়ই ভালো আছো। আমার দিনগুলো এখন স্মৃতি হাতড়ে কাটে। সারাক্ষন তোমাকে নিয়ে ভাবি। তোমার ছবিগুলি বার বার দেখি।---

-সুতপা কি যেন আনমনা হয়ে ভাবে। নাকের উপরের চামড়াগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। চোখের দুপাশ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে চিবুক অবধি। মাঝে মধ্যে বাম হাতে চুলগুলিতে এলো মেলো ভাবে চেপে ধরছে। আবার পড়তে লাগলো-

“প্রায় রাতেই তোমাকে আমি স্বপ্ন দেখি। এক সাথে পার্কে ঘুরতে যাই। হাতে হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে কতো কথা বলি। মাঝে মধ্যে স্বপ্নে তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরো। আমার খুব ভালো লাগে। তোমার আমার সম্পর্কের কথা ঘরের সবাই জানে। এখন আর কোন ভয় নেই। আজ তোমাকে একটা মহা সার্প্রাইজ দেবো। তুমি কখনো চিন্তাও করতে পারবে না। তা হলে এবার বলেই ফেলি। আমি জুলাই মাসে মস্কোতে পড়তে আসছি। সব ঠিক ঠাক। আমার পরিবারের সিদ্ধান্ত আমি মস্কোতে পড়াশুনা করি। আমার যে কি ভালো লাগছে তোমাকে বুঝাতে পারবো না। তুমি কিন্তু এয়ারপোর্টে আসবে। মস্কোতে এসেই প্রথম তোমার মুখটি দেখতে চাই। আসবে তো? আজ আর না। গত চিঠিতে আমার কয়েকটি ছবি পাঠিয়েছিলাম। তুমি ভালো থেকো সাবধানে থেকো। আর আমাকে মনে রেখ।

ইতি

তোমার জবা

**(চলবে---)**

**ড. পল্টু দত্ত**

শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিষ্ট